রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, অক্টোবর ১৮, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
জনস্বাস্থ্য-২ অধিশাখা

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ, ২৩ আশ্বিন ১৪২২ বাংলা/০৮ অক্টোবর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৫.১৬১.০৫৩.০০.০০.০০২.২০১৩-৪৪০—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমোদনক্রমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিম্ন বর্ণিত "বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫" প্রণয়ন করিলেন :

## জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫

### পুষ্টি উন্নয়নের বুনিয়াদ

শিরোনাম : বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টিনীতি-২০১৫

### ১। ভূমিকা

পুষ্টি প্রতিটি মানুষের প্রয়োজনীয় শারীরিক বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ ও অটুট স্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। পুষ্টির অভাবে মাতৃগর্ভে শিশুর কাঙ্খিত বৃদ্ধি ঘটে না, শিশুর জন্ম-ওজন কম হয়। খর্বতা, কৃশতা, কম ওজন ও অনুপুষ্টি-কণা ঘাটতি এসব অপুষ্টিরই পরিণতি। শিশুমৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ এই অপুষ্টি। অপুষ্টির একটি রূপ পুষ্টিহীনতা, অন্য রূপ স্থূলতা ও পুষ্টিজনিত অসংক্রামক রোগসমূহ। পুষ্টিহীনতা শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত করে। পুষ্টিহীন শিশু বহুবিধ সীমাবদ্ধতা নিয়ে বেড়ে ওঠে, ফলে পরিণত বয়সে তার পক্ষে সমাজ ও জাতির উন্নতিতে যথাযথ অবদান রাখা সম্ভব হয় না।



মূল্য ঃ টাকা ১৬.০০

পুষ্টি মানুষের মৌলিক অধিকার। পুষ্টিবিধানের সঙ্গে ন্যায্যতা ও সমতার বিষয় জড়িত। রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি বর্ণনা করার সময় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে পুষ্টি বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: 'জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে....'। ১৯৯৭ সালে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টিনীতি তৈরি হওয়ার পর গত দুই দশকে বাংলাদেশের পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। তার পরও অনেক ক্ষেত্রে পুষ্টির স্তর কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। মানবিক, সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপুষ্টি দূর করা জরুরি। দেশব্যাপী শহর ও গ্রামে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের ওজনাধিক্য, স্থূলতা, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হার্ট এ্যাটাক, স্ট্রোক, ক্যানসার ও অস্টিওপোরোসিস (নরম হাড়) বর্তমানে পুষ্টিজনিত সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। শারীরিক সক্রিয়তার ঘাটতি, কায়িক শ্রমে অনীহা, ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যাভাস এবং অলস জীবন-যাপন এর জন্য দায়ী। পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ, কৌশলপত্র তৈরি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন-এসবের প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন প্রামাণিক তথ্য রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে 'বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টিনীতি, ২০১৫' তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। পুষ্টিনীতি জনগণের পুষ্টিমানের উন্নতিকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন। এই নীতি প্রণয়নে বৈশ্বিক নীতিমালা (আইসিএন ২) এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতিমালা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এই পুষ্টিনীতি সরকারের গৃহীত স্বাস্থ্য, খাদ্য, কৃষি, পরিবেশ ও শিক্ষাসহ অন্যান্য জাতীয় নীতির পরিপূরক হিসাবে বাস্তবায়িত হবে।

## ২। পটভূমি

শৈশবকালীন অপুষ্টির হার বাংলাদেশে হ্রাস পাচ্ছে, তবে হ্রাস পাওয়ার গতি কম। অপুষ্টির সবচেয়ে প্রচলিত রূপ হলো খর্বতা (stunting), যা দীর্ঘকাল অপুষ্টিতে ভোগার পরিণাম। একটি খর্বকায় শিশুর ঘন ঘন সংক্রমণের প্রবণতা দেখা যায় এবং তার মস্তিস্কের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। বাংলাদেশে অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী প্রতি ৫ জন শিশুর মধ্যে ২ জন খর্বকায়। এই হার ধনী জনগোষ্ঠী অপেক্ষা দরিদ্রদের মধ্যে দ্বিগুণ। ২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল, এই ১০ বছরে খর্বতা হ্রাসের হার বছরে মাত্র ১.৫ শতাংশ[১]। খর্বতা হ্রাসের হার বছরে ২ বা ৩ শতাংশ হলে তা সন্তোষজনক হতো। কৃশতা (wastin) তীব্র অপুষ্টিরই পরিণাম। গত এক দশকে দেশে কৃশতার হার ধীরগতিতে কমেছে। বাংলাদেশে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের শতকরা ১৪[১] ভাগ কৃশকায়। কৃশতার ভীতিকর রূপ হলো মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি (severe acute malnutrition), যার ব্যাপকতার হার বর্তমানে ৩.১ শতাংশ[১]। বলা যায় যে, অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী প্রায় সাড়ে চার লক্ষ শিশু মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির শিকার। পাশাপাশি এই অবস্থা নিয়ে যারা বেঁচে আছে তাদের মানসিক বৃদ্ধিও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বয়স ও লিঙ্গ অনুযায়ী স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজনের শারীরিক পরিস্থিতিকে কম-ওজন (underweight) বলা হয়।

বাংলাদেশে শৈশবকালীন অপুষ্টির মূল কারণ যথাযথভাবে শিশুখাদ্য ও পুষ্টিবিধির চর্চা না করা। শিশুখাদ্য ও পুষ্টিবিধিতে বলা হয় যে, সকল নবজাতককে জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে বুকের দুধ পান করানো শুরু করতে হবে, শিশু পূর্ণ ৬ মাস (১৮০ দিন) পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ পান করাতে হবে এবং পূর্ণ ৬ মাস বয়সের পর থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধের পাশাপশি ঘরে তৈরি পুষ্টিকর বাড়তি খাবার খাওয়াতে হবে। বাংলাদেশে ৬ মাসের কম বয়সী শিশুদের শুধু বুকের দুধ পান করানোর হার ৫৫ শতাংশ। ৬ মাস থেকে পূর্ণ ২৩ মাস বয়সী ২৩ শতাংশ শিশুকে ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য খাদ্য (minimum acceptable diet)[১] খাওয়ানো হয়।

বাংলাদেশের বয়ঃসন্ধিকালীন মেয়েদের এক-চতুর্থাংশ অপুষ্টির শিকার। প্রজননক্ষম বয়সের প্রতি ৮ জন নারীর এক জন খর্বকায়। খর্বকায় নারীর সন্তান জন্মদানের সময় জটিলতার ঝুঁকি থাকে । একই কারণে তাদের গর্ভের শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি অনেক গুণ বেশি থাকে, ফলে নবজাতকের কম জন্মওজনের আশঙ্কাও বৃদ্ধি পায়। বাল্য বিবাহ এবং অল্প বয়সে গর্ভধারণ এতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে কম জন্মওজনের শিশুর হার অনেক বেশি। একজন খর্বকায় মায়ের কম জন্মওজনের শিশু জন্ম দেওয়ার আশঙ্কা সব সময় থাকে, আবার শিশুটি বয়স্ক হওয়ার পরও খর্বতা কাটিয়ে উঠতে পারে না। এভাবে খর্বতা প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে গিয়ে পৌছায় এবং এটি অপুষ্টির একটি দুষ্টচক্র। গ্রাম ও শহরের অপুষ্টি পরিস্থিতিতে পার্থক্য রয়েছে, বিশেষত শহরাঞ্চলের বস্তিতে বসবাসকারী নারী ও শিশুরা তুলনামূলকভাবে খারাপ অবস্থায় আছে।

জনগণের বিশেষত নারীদের মধ্যে ওজনাধিক্য (overweight) এবং স্থূলতার (obesity) হার ক্রমবর্ধমান। ওজনাধিক্য ও স্থূলতার ফলে দেশে অপুষ্টিজনিত দীর্ঘমেয়াদি ব্যাধি যেমন: টাইপ-২ ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের প্রকোপ বাড়ছে। ওজনাধিক্য এখন দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। শহরের বস্তি এলাকায় বসবাসকারী মানুষের মধ্যে এই সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ব্যাপক মাত্রায় অনুপুষ্টি-কণার (micronutrient) ঘাটতি রয়েছে। শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বিভিন্ন ধরনের অনুপষ্টি-কণা। এর মধ্যে ভিটামিন 'এ', আয়রন, আয়োডিন, জিংক, ভিটামিন 'ভি-১২', ফলিক অ্যাসিড উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খাদ্যে আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন 'বি-১২' ঘাটতির কারণে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশু এবং নারীদের উল্লেখযোগ্য অংশ রক্তস্বল্পতায় ভোগে। রক্তস্বল্পতার কারণে নারীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি যেমন বৃদ্ধিপায়, তেমনি তাঁদের শিশুদের শরীরে সঞ্চিত আয়রনের পরিমাণ কমে যায়, তাঁদের শিশুরাও রক্তস্বল্পতায় ভোগে। রক্তস্বল্পতা জাতীয় অর্থনীতির ওপর একটি বোঝাস্বরূপ।

দেশের পুষ্টি পরিস্থিতির পরিবর্তন ও উন্নতির লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের মূলধারায় পুষ্টি কার্যক্রমকে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অন্যান্য খাতের জন্য গৃহীত নীতিসমূহেও পুষ্টির জন্য কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। এই পুষ্টিনীতি মূলত জনগণের পুষ্টির মান উন্নয়নে রাষ্ট্রের অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

১ বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে, ২০১৪।

৩। রূপকল্প

বাংলাদেশের মানুষ কাঙ্খিত পুষ্টি লাভের মাধ্যমে সুস্থ ও উৎপাদনশীল জীবনের অধিকারী হবে।

৪। লক্ষ্য

জাতীয় পুষ্টিনীতির লক্ষ্য জনগণের, বিশেষত মা, কিশোরী ও শিশুসহ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর পুষ্টি অবস্থার উন্নতিসাধন করা; অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা; এবং জীবনের মান উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

৫। উদ্দেশ্য

৫.১. জনগণের, বিশেষত শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মাসহ সকল নাগরিকের পুষ্টি অবস্থার উন্নতিসাধন।

৫.২. বৈচিত্র্যপূর্ণ ও পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসম্পন্ন নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যভ্যাস নিশ্চিত করা।

৫.৩. পুষ্টিকেন্দ্রিক (nutrition specific) বা প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করা।

৫.৪. পুষ্টিসম্পর্কিত (nutrition sensitive) বা পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করা।

৫.৫. পুষ্টি নিশ্চিত করতে বহু খাতভিত্তিক কার্যক্রম জোরদার করা এবং সংশ্লিষ্ট সকল খাতের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা।

৬। কৌশলসমূহ:

৬.১. জনগণের, বিশেষত শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মাসহ সকল নাগরিকের পুষ্টি অবস্থার উন্নতিসাধন।

এই উদ্দেশ্য অর্জনের কৌশলসমূহ:

৬.১.১ সকল নাগরিকের পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিত করা

ব্যক্তি ও পরিবারের পুষ্টি অবস্থার উন্নতিকল্পে খাদ্যের সহজপ্রাপ্যতা, খাদ্যের সহজলভ্যতা এবং পুষ্টিকর খাদ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার সার্বিক পুষ্টি অবস্থার উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। জাতীয় পুষ্টিনীতির উদ্দেশ্য জীবনচক্রের সকল পর্যায়ে নিরাপদ ও সুষম খাদ্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে যথাযথ পুষ্টি নিশ্চিত করা।

৬.১.২ জীবনচক্রের সকল পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করা

জীবনচক্রের সকল পর্যায়ে পুষ্টি নিশ্চিত করা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। অপুষ্টির শিকার মায়ের গর্ভধারণ ও পরবর্তী সময়ে অপুষ্ট সন্তানের জন্মের মধ্য দিয়ে অপুষ্টির দুষ্টচক্রের যাত্রা শুরু হয়, যা জীবনের সকল পর্যায়ে প্রভাব ফেলে, এমনকি পরবর্তী প্রজন্মের ওপর সেই প্রভাব অব্যাহত থাকে। অপুষ্টির এই আন্তপ্রজন্ম প্রভাব হ্রাস করার লক্ষ্যে জাতীয় পুষ্টিনীতি নিম্নবর্ণিত জীবনচক্র কৌশলের ওপর গুরুত্ব আরোপ করছে;

৬.১.২.১ সকল গর্ভবতী মায়ের পূর্ণ গর্ভকালব্যাপী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের যথাযথ ও পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা, যাতে সুস্থ ও কাঙ্খিত জন্ম ওজন নিয়ে শিশুর জন্মগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

৬.১.২.২ সহায়ক পারিবারিক পরিবেশ, সেবা ব্যবস্থা ও আইনি নিরাপত্তাব্যবস্থা (Regulatory safety net) নিশ্চিত করার মাধ্যমে দুগ্ধদানকারী মায়েরা যেন পূর্ণ ৬ মাস শিশুদের শুধু বুকের দুধ পান করাতে পারেন এবং দুই বছর পর্যন্ত অব্যাহত রাখেন, তা নিশ্চিত করা।

৬.১.২.৩ সকল শিশুর শৈশবের বছরগুলোতে যথাযথ পুষ্টির ভিত্তি তৈরি করার লক্ষ্যে পূর্ণ ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধ পান করানো এবং ৬ মাস বয়স থেকে বুকের দুধের পাশাপাশি বাড়িতে তৈরি সুষম পুরিপূরক খাবার দেওয়া ও এর সাথে দুই বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ পান করানো নিশ্চিত করা।

৬.১.২.৪ স্বাস্থ্যবান ও কর্মক্ষম ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ার লক্ষ্যে বাল্যবিবাহ রোধ করাসহ কিশোর-কিশোরীদের বৃদ্ধি ও বিকাশে সহায়তাকারী পর্যাপ্ত পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

৬.১.২.৫ অপুষ্টিজনিত অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক ও বৃদ্ধদের জন্য যথাযথ পুষ্টি নিশ্চিত করা।

৬.১.২.৬ বর্তমানে প্রক্রিয়াজাত ও বাণিজ্যিক খাবারের বিজ্ঞাপনের প্রভাবে মানুষের, বিশেষ করে শিশুদের খাদ্যভ্যাস বিপজ্জনকভাবে হুমকির মুখে এর ফলে স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি অসংক্রামক ব্যাধি (chronic non-communicable disease) মহামারি আকার ধারণ করেছে। এসব প্রক্রিয়াজাত ও বাণিজ্যিক খাবারের অবাধ বাজারজাতকরণ এবং বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে কার্যক্রম হাতে নেওয়া সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন প্রণালীতে উৎসাহ প্রদান।

৬.১.২.৭ বাল্য বিবাহ রোধ, বিলম্বে গর্ভধারণ ও দুই সন্তান জন্মের মধ্যবর্তী সময়কাল বৃদ্ধি করতে চলমান পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহের সহজপ্রাপ্যতা ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৬.১.৩ সুবিধাবঞ্চিত জনগণের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী সর্বদা প্রাকৃতিক ও মনুষ্য দৃষ্ট দুর্যোগে এবং অসুস্থতার সময় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় পুষ্টিনীতির কার্যক্রম হবে:

৬.১.৩.১ গ্রাম ও শহরের দারিদ্রপীড়িত এলাকাসমূহে ও পুষ্টি জরিপ (nutrition surveillance) দ্বারা চিহ্নিত দুর্গম এলাকাসমূহে বসবাসরত মানুষের, যাদের খাদ্যপ্রাপ্তির সুযোগ খুব সীমিত ও যারা উপার্জনক্ষম নয়, তাদের উদ্দেশ্য করে পুষ্টি কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিত করা।

৬.১.৩.২ আপৎকালীন সময়ে (প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী অথবা সংঘাত) ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা এবং দুর্যোগকালীন প্রস্তুতির পরিকল্পনাতে আক্রান্ত মানুষের মৌলিক পুষ্টি চাহিদা পূরণের বিষয়টি যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিত করা। এ সংক্রান্ত আইনের (মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহার ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০১৩ প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

৬.১.৩.৩ দীর্ঘমেয়াদি ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং যক্ষা ও এইচআইভি/এইডস নিয়ে জীবনধারণ করছেন এমন ব্যক্তিদের অসুস্থতার সময় ও পরবর্তীকালে পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা।

৬.২ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসম্পন্ন নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যভ্যাস নিশ্চিত করা। খাদ্যবৈচিত্র্য বৃদ্ধি ও খাদ্যের পরিমাণ ও গুণগতমান নিশ্চিত করা।

পূর্ণবয়স্ক একজন বাংলাদেশীর গড় শক্তি চাহিদা ও প্রাপ্তির মধ্যে পার্থক্য (energy gap) ৮২ কিলোক্যালরি। দেখা গেছে, বাংলাদেশের মানুষ সুপারিশকৃত ২৪০০ কিলোক্যালরি[২] শক্তির পরিবর্তে দৈনিক গড়ে ২৩১৮ কিলোরক্যালরি[৩] শক্তি গ্রহণ করে। এই হিসাব শারীরিক ক্রিয়ার মাত্রা (physical activity level), গড় বিপাকক্রিয়ার হার (basal metabolic rate) এবং কাঙ্খিত দৈহিক ওজনের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। তবে আর্থসামাজিক অবস্থা, নগর বা গ্রামাঞ্চলে বসবাস এবং খাদ্যনিরাপত্তা এসবের ওপর ভিত্তি করে শক্তি গ্রহণের পরিমাণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যতালিকায় বেশির ভাগই শস্যজাতীয় খাদ্য। শকতরা ৭০ ভাগ শক্তিই আসে শস্যজাতীয় খাদ্য থেকে। খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাণিজ খাবার, দুধ, শাক-সবজি ও ফল থাকে না এবং সে কারণে পুষ্টি চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ হয় না। খাদ্যতালিকায় উন্নতমানের আমিষ ও অনুপুষ্টি কণার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

খাদ্যবৈচিত্র্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রণীত কৌশলসমূহ

খাদ্যবৈচিত্র্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত কৌশলসমূহের মধ্যে কৌশল হলো গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের কাছে খাদ্যের বৈচিত্র্য এবং নাম.ধরনের খাবারের সংমিশ্রণে খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব অবহিত করা, যেন তাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভাসের পুষ্টিকণাও অনুপুষ্টি কণার (macronutrient ও micronutrient) সুষম সমন্বয় হয়। পুষ্টি শিক্ষার সাথে সাথে আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (behavior change communication) নিশ্চিত করা।

খাদ্যবৈচিত্র্য অর্জনের লক্ষ্যে খাদ্যভিত্তিক কৌশলকে উৎসাহ প্রদান করা এবং কৃষি (মৎস্য ও প্রাণি সম্পদসহ) খাতকে গুরুত্ব প্রদান করা। এ ছাড়া খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্রাম ও শহরাঞ্চলের মানুষের কাছে খাদ্যবৈচিত্রের তথ্যাদি পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

খাদ্যবৈচিত্র্য অর্জনের লক্ষ্যে খাদ্যভিত্তিক ও কৃষি খাতের গুরুত্ব বৃদ্ধিতে যেসব কৌশল অবলম্বন করা হবে:

৬.২.১ খাদ্যবৈচিত্র্য অর্জনের জন্য বাড়িতে বাগান তৈরি, সীমিত আকারে পশু পালন এবং বাড়ির আঙিনায় হাঁস-মুরগি পালন ও মৎস্য চাষ (পারিবারিক অথবা সমষ্টিগতভাবে) সমন্বিতভাবে করার উদ্যোগ নিতে মানুষকে উৎসাহিত করা, যেন তাদের কাছে বৈচিত্র্যপূর্ণ, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায়।

৬.২.২ প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, অতিরিক্ত লবণ, সম্পৃক্ত চর্বি, ট্রান্স ফ্যাট (trans fat) পরিহারে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিশেষ আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ কার্যক্রম হাতে নেওয়া।

[২] Household Income and Expenditure Survey Report-2010।
[৩] FAO/WHO কর্তৃক সুপারিশকৃত daily energy requirement।

৬.২.৩ স্থানীয় ও দেশী প্রজাতির শস্য, ফল ও সবজি চাষে উৎসাহ দেওয়া হবে, যেন জীববৈচিত্র্যের সুবিধা গ্রহণ করা যায় এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে খাদ্যবৈচিত্র্য বজায় রাখা সম্ভব হয়।

৬.২.৪ খাদ্যবৈচিত্র্য অর্জনে নানা রকম খাবারের সঠিক সংমিশ্রণ প্রয়োজন। বিভিন্ন শ্রেণির খাদ্যের সংমিশ্রণ করে খাবারের পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করতে জনগণকে উৎসাহিত করা।

৬.২.৫ পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাদ্য তৈরির অভ্যাসকে উন্নত করা, উৎসাহ দেওয়া ও জোরদার করা, যেন নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য গ্রহণ বৃদ্ধি পায় ও খাদ্যের পুষ্টিমান অক্ষুন্ন থাকে। সারা বছর খাদ্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় ও জুতসই কারিগরি কৌশল ব্যবহার করে খাদ্য তৈরি ও সংরক্ষণে উৎসাহ দেওয়া।

৬.২.৬ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা মেটাতে বাড়ি সন্নিহিত জলাশয়ে পুষ্টিসমৃদ্ধ দেশীয় ছোট মাছ, যেমন মলা, ঢেলা, পুঁটিজাতীয় মাছ চাষ ও সংরক্ষণে উৎসাহ দানের মাধ্যমে চাহিদা মাফিক প্রাণিজ আমিষের জোগান নিশ্চিত করা।

৬.২.৭ দুর্যোগ ও মারাত্মক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত মানুষের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পূরক খাদ্য (supplementary food) প্রদান করা।

৬.২.৮ খাবার 'সমৃদ্ধকরণ' (forfitfication) কার্যক্রম হাতে নেওয়া এবং এর ব্যবহার ও পরিধি বৃদ্ধি করা যেমন; খাবার লবনে আয়োডিন, ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' শিশুদের জন্য বাড়ীতে তৈরি খাদ্য সমৃদ্ধ করা)।

৬.২.৯ অপুষ্টি, ওজনাধিক্য এবং অনুপুষ্টি-কণার ঘাটতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে আমিষ, স্নেহ, শর্করা ও অনুপুষ্টি-কণার যথাযথ ও সঠিক অনুপাতে গ্রহণ করাকে জনপ্রিয় করা।

৬.২.১০ খাদ্য উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনা এবং শিশু ও তার পরিবারের বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্যগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে খর্বতা, কৃশতা ও অনুপুষ্টি-কণার ঘাটতি হ্রাস করা।

৬.৩ পুষ্টিকেন্দ্রিক বা প্রত্যক্ষ কার্যক্রম জোরদার করা।

অপুষ্টি দূর করতে বাংলাদেশে পরস্পর নির্ভরশীল দুই ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে: পুষ্টিকেন্দ্রিক বা প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম এবং পুষ্টিসম্পর্কিত বা পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম। শিশুদের জন্য পুষ্টিকেন্দ্রিক বা প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রমের মধ্যে আছে: জন্মের পর প্রথম ৬ মাস শুধু মায়ের দুধ পান করানো, ৬ মাসের বেশি বয়সী শিশুকে বুকের দুধের পাশাপাশি যথাযথভাবে ঘরে তৈরি পরিপূরক খাবার খাওয়ানো, শিশুকে খাওয়ানোর আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, শিশুকে প্রতি ৬ মাস অন্তর ভিটামিন 'এ' খাওয়ানো, বিভিন্ন অপুষ্টি-কণার সম্পূরন, ডায়রিয়া চিকিৎসার অংশ হিসেবে জিংক প্রদান, মাঝারি ও মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির চিকিৎসা ইত্যাদি। কিশোরী ও নারীদের জন্য পারিবারিক পর্যায়ে পরামর্শ প্রদান করে পুষ্টিজ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে আচরণগত পরিবর্তন এনে পুষ্টির মান উন্নয়ন; প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়রন, ফলিক অ্যাসিড অথবা অনুপুষ্টি-কণা সম্পূরক হিসেবে প্রদান, আয়োডিনসমৃদ্ধ লবণ ব্যবহার, গর্ভাবস্থায় সম্পূরক হিসেবে ক্যালসিয়াম ব্যবহার, ওজনাধিক্য ও স্থূলতার চাপ পরিহারের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটিতে অপুষ্টি প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।

**পুষ্টিকেন্দ্রিক বা প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম প্রসারে প্রণীত কৌশলসমূহ:**

৬.৩.১ গর্ভকালীন পর্যাপ্ত ওজন বৃদ্ধির জন্য গর্ভকালে যথাযথ পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণে মায়েদের উদ্বুদ্ধ করা, পূর্ণ গর্ভকাল এবং দুগ্ধদান করার সময়ে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অনুপুষ্টি-কণা বিশেষত আয়রন-ফলিক অ্যাসিড গ্রহণ নিশ্চিত করা, সংক্রমণ রোধ ও যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করা, গর্ভকালে কায়িক শ্রম কমানো ও যথাযথ বিশ্রাম নিশ্চিত করা, গর্ভকালে তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণ ও ধূমপান নিরোধে আচরণগত পরিবর্তন সাধন করা।

৬.৩.২ দুগ্ধদানকারী মায়ের অপুষ্টি রোধে পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া ও শিশুর যথাযথ যত্ন নেওয়া নিশ্চিত করা।

৬.৩.৩ নবজাতকের যথাযথ যত্ন নিশ্চিত করতে জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে মায়ের দুধ পান করানো শুরু করা, ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধ পান করানো, ৬ মাস বয়স থেকে দিনে ৩-৪ বার ঘরে তৈরি পরিপূরক খাবার (ন্যূনতম ৪টি খাদ্যশ্রেণির সমন্বয়ে তৈরি খাবার) দেওয়ার সাথে দুই বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে মায়ের দুধ পান করানোর জন্য উৎসাহিত করা।

৬.৩.৪ পুষ্টির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এমন যেকোনো সংক্রমণের দ্রুত চিকিৎসা করা।

৬.৩.৫ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি উভয় স্থানে মাঝারি ও মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির চিকিৎসা করা।

৬.৩.৬ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য পরিবার ও সমাজের মাধ্যমে যত্ন নিশ্চিত করা এবং শিশু বিকাশে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে উদ্বুদ্ধ করা।

৬.৩.৭ কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক বৃদ্ধি যেন যথাযথ হয় এবং তারা কাঙ্খিত উচ্চতা ও ওজনসহ পূর্ণ বয়স্ক মানুষ হিসেবে বিকাশ লাভ করতে পারে তার জন্য তাদের পর্যাপ্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিত করা।

৬.৩.৮ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুষ্টিশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করা।

৬.৩.৯ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য শক্তি, আমিষ ও অনুপুষ্টি-কণা সমৃদ্ধ খাবারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

৬.৩.১০ গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এবং শহরাঞ্চলে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবার সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবার সমন্বয়ের মাধ্যমে পুষ্টিকেন্দ্রিক কার্যক্রমের বিস্তার ঘটানো।

৬.৩.১১ শহরের বস্তি ও দুর্গম এলাকাসমূহে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য পুষ্টিকেন্দ্রিক প্রত্যক্ষ কার্যক্রমের বিস্তার ঘটানো।

৬.৩.১২ পুষ্টিশিক্ষা, পরামর্শ, তথ্যের মাধ্যমে আচরণ পরিবর্তন করা। জনগণের পুষ্টিমান উন্নয়নের জন্য সুষম খাদ্য, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিমান এবং সুস্থতার জন্য কায়িক পরিশ্রম ও শরীরচর্চা বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল অংশীজনের সমন্বয়ে সকল মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা। পরিবার পরিকল্পনা, টিকাদান ও খাবার স্যালাইনের মতো সফল জাতীয় কর্মসূচির অভিজ্ঞতার আলোকে পুষ্টিসম্পর্কিত কার্যক্রম ও খাদ্যনিরাপত্তা নিয়ে জাতীয়ভাবে গণমাধ্যমে প্রচারের পরিকল্পনা করা এবং এই খাতে সম্পদ বরাদ্দ রাখা।

৬.৩.১৩ উপযুক্ত অনুপুষ্টি-কণা সমৃদ্ধ পারিবারিক খাদ্যের পরিচিতি ও খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা।

৬.৩.১৪ প্রচলিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সর্বজনীন করা, দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা এবং এর জন্য জনশক্তি পরিমাপ করা (বিশেষত কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা) যাতে স্বাস্থ্যকর্মী ও সুফলভোগীর আনুপাতিক হার সঠিক থাকে এবং পুষ্টি কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে।

৬.৩.১৫ স্বাস্থ্যকর্মীদের সকল শূন্যপদ পূরণ ও কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় কর্মী ও উপকরণ দিতে হবে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সর্বনিম্নস্তর যথা কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপকেন্দ্র, পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে পুষ্টিসেবা দানের উপযোগী করা।

৬.৩.১৬ তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মাঠকর্মীদের কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে পুষ্টিসেবাকে যথাযথভাবে স্বাস্থ্যসেবার মূলধারায় আনা।

৬.৩.১৭ জনগণের সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে সরকার ও বেসরকারি খাতের সকল স্তরের পুষ্টি সেবাদানকারীদের জবাবদিহি বৃদ্ধির মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা।

৬.৩.১৮ পুষ্টি কার্যক্রমের জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি জাতীয় শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রণয়ন ও প্রচলন করা।

৬.৩.১৯ একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা তৈরির জন্য চাহিদা নিরূপণ এবং সম্পদের যথাযথ বন্টন করা।

৬.৩.২০ হাসপাতালে ও জনস্বাস্থ্য পুষ্টি কার্যক্রমে মাঠ পর্যায়ে পুষ্টিবিদ নিয়োগ করা।

৬.৪ পুষ্টিসম্পর্কিত বা পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করা ।

অপুষ্টির সমস্যা, বিশেষত কম জন্মওজন ও খর্বতা, শুধু পুষ্টিকেন্দ্রিক কার্যক্রম দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। এ ক্ষেত্রে পুষ্টিকেন্দ্রিক কার্যক্রমের পাশাপাশি পুষ্টিসম্পর্কিত কার্যক্রমের, বিশেষত খাদ্য নিরাপত্তা, নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন, কাজের সুযোগ বৃদ্ধি, পরিচ্ছন্নতা বিধি ও স্যানিটেশন, পুষ্টিবান্ধব চাষাবাদ, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিস্তার ঘটাতে হবে।

**পুষ্টিসম্পর্কিত বা পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম বিস্তারে প্রণীত কৌশলঃ**

৬.৪.১ খানা (household) পর্যায়ে খাদ্যনিরাপত্তা বৃদ্ধি। খাদ্যভিত্তিক খাদ্য নির্দেশনার প্রচার ও উৎসাহ প্রদান। তথ্যভিত্তিক খাদ্য বাছাই (informed choice) ও ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করা।

৬.৪.২ পুষ্টিবান্ধব চাষাবাদের মাধ্যমে ফল, শাক-সবজি, মুরগি, মাছ, মৎস্যজাত দ্রব্য, দুধ ও মাংস উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উৎসাহ প্রদান।

৬.৪.৩ নারী শিক্ষার হার বাড়ানো, নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, নারীর উপার্জনের সুযোগ তৈরি এবং বিশ বছর বয়সের পর গর্ভধারণের উপর গুরুত্ব প্রদান।

৬.৪.৪ নানা রকম সংক্রমণ, যেমন ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া ও পরিবেশজনিত কারণে সৃষ্ট পেটের পীড়া শিশু পুষ্টির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এসব সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা ও পয়ঃব্যবস্থা শক্তিশালী করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতাবিধি মেনে চলতে বিশেষত সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যাপারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা।

৬.৪.৫ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, প্রতিষ্ঠান, সিভিল সোসাইটি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে পুষ্টি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা।

৬.৪.৬ অ-শস্যজাতীয় (non-cereal) কৃষিপণ্য যেমন, ডাল, ফল ও সবজির ফলন বাড়াতে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা।

৬.৪.৭ পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের (যেমন খাদ্য, কৃষি, শিক্ষা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, দুর্যোগ ও ত্রাণ) সমন্বয়ে নতুন কার্যক্রম ও কৌশল গ্রহণ করা।

৬.৪.৮ কৃষি, খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, মহিলা ও শিশুবিষয়ক, শিক্ষা, শিল্প এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে পুষ্টিসম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন হবে; এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপরিউক্ত মন্ত্রণালয়সমূহ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় করা।

৬.৫ পুষ্টি নিশ্চিত করতে বহু খাতভিত্তিক কার্যক্রম জোরদার করা এবং সংশ্লিষ্ট সকল খাতের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনের কৌশলসমূহ:

পুষ্টিমান উন্নয়নের জন্য সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতাবিধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশব্যাপী পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ও প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ, পরিকল্পনা ও অর্থ মন্ত্রণালয়, এনজিও এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে ফলদায়ক যৌথ উদ্যোগ ও সমন্বয়ের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আগামী এক দশকের জন্য একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (ব্যয়, নির্দেশক ও লক্ষ্যমাত্রাসহ) তৈরী করা হবে। পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিম্নলিখিত খাতসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে:

- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রমসমূহ
- জনশক্তি সম্পৃক্তকরণ, এর মধ্যে পুষ্টিসেবা কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, শিক্ষা এবং নারীর ক্ষমতায়নসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহের সমন্বয় বৃদ্ধিকরণ সহায়তা
- পুষ্টি পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের মূল্যায়ন
- পুষ্টি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত জনশক্তির উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন
- পুষ্টিশিক্ষাকে সকল ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও সকল প্রকার সাধারণ পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা
- প্রায়োগিক গবেষণা, উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং মতামত (ফিডব্যাক) প্রদান।

৬.৫.১ অপুষ্টির হার অনেক বেশি এমন নগর-অঞ্চলে বিশেষত বস্তি এলাকায় স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় একত্রে কাজ করা।

৬.৫.২ গ্রাম ও শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মহল্লায় ওজনাধিক্য ও স্থূলতা হ্রাসকল্পে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়ামকে উৎসাহিত করা।

৬.৫.৩ পুষ্টিনিরাপত্তা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা বেষ্টনী, স্বাস্থ্যবিধি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতাবিধি এবং জীবিকার সংস্থান—এসবের উন্নতিকল্পে অর্থবহ বহু খাতভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তর্জাতিক সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এনজিওসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সহযোগিতা ও সমন্বয় জোরদার করা।

৬.৫.৪ অংশীদারি শক্তিশালী করে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বেসরকারি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ের মাধ্যমে একত্রে পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

৬.৫.৫ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কৌশলপত্রে পুষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, বিশেষত খাদ্য কর্মসূচিতে খাদ্যবৈচিত্র্যের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা, অতিদরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে পুষ্টি প্রকল্প গ্রহণ ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সাথে পুষ্টি কর্মসূচির সংযোগ স্থাপন করা।

৬.৫.৬ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পুষ্টি গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হবে, যেন নীতি নির্ধারকগণ পুষ্টি কার্যক্রম ও কৌশল সম্পর্কে অবগত থাকতে পারেন ও সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এ ছাড়া প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পুষ্টি কার্যক্রম আরও নিখুঁত করার চেষ্টা করা।

৬.৫.৭ অ-শস্যজাতীয় খাদ্যের ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হবে। খাদ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে অতিদরিদ্রদের জন্য খাদ্যনিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

৬.৫.৮ খাদ্যে ভেজাল রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ আইনের প্রয়োগ জোরদার করা।

৬.৫.৯ জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে খাদ্য নিরাপত্তা, জীবিকা, রোগ-ব্যাধি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির খাপ খাওয়ানো।

৬.৫.১০ দেশের পুষ্টি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নে বহু খাতভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও কার্যকর সমন্বয়ের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় পুষ্টি পরিষদকে জোরদার করা।

## ৭। উপসংহার

জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫-তে অপুষ্টির বিভিন্ন কারণ চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে জনগণের যথাযথ পুষ্টি নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই নীতি বিদ্যমান কৌশলসমূহকে বাস্তবায়ন ও জোরদার করতে, নতুন কর্মকৌশল প্রণয়নে এবং বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য পুষ্টিমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মকৌশল গ্রহণে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

পুষ্টিমান অর্জনের নির্দেশকসমূহ

- জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ানোর হার বৃদ্ধি
- পূর্ণ ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ খাওয়ানোর হার বৃদ্ধি
- ২০—২৩ মাস বয়সী শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর হার বৃদ্ধি
- ৬—২৩ বয়সী শিশুদের ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য খাদ্য গ্রহণের হার বৃদ্ধি
- কম জন্মওজনের হার হ্রাস করা
- অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের খর্বতা হ্রাস করা
- অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের কৃশতা হ্রাস করা
- অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী কম ওজবিশিষ্ট শিশুদের সংখ্যা হ্রাস করা
- শিশুদের মারাত্মক অপুষ্টির হার হ্রাস করা
- কিশোরীদের অপুষ্টি হার হ্রাস করা
- ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল প্রদানের হার বৃদ্ধি করা
- গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের অপুষ্টির হার হ্রাস করা
- আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণের হার বৃদ্ধি করা
- মায়েদের স্থূলতা (বিএমআই>২৩) হ্রাস করা
- নারীদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার হার হ্রাস করা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ আব্দুল মালেক**
যুগ্মসচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd